উপসংহার

বিশ শতকের সাহিত্য সমাজে একটি বহু চর্চিত বিষয় আখ্যানতত্ত্ব। মূলত রুশ সংগঠনবাদের সূত্রেই আখ্যানতত্ত্বের আলোচনা, বহু পূর্বে গ্রীসে অ্যারিস্টট্‌ল আখ্যানতত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা শুরু করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনার স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আখ্যানতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা বিশ শতকেই, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের হাত ধরে। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য আলোচনায় আখ্যানতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মূলত বাংলা উপন্যাস চর্চার বিষয়ে এই তত্ত্ব আজ অপরিত্যজ্য।

রুশ সংগঠনবাদীরা আখ্যানের দুটি ভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। একটির নাম দিয়েছেন fabula এবং অন্যটি Syurhet। fabula বলতে বুঝিয়েছেন আখ্যানের ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক উপস্থিতি। আর Syurhet বলতে বুঝিয়েছেন পাঠকৃতি বা Text এ ঘটনাবলীর উপস্থিতি, তার কালক্রম। কারণ ঘটনা যেভাবে বা যেক্রমে ঘটে Text এ সেই ক্রম রক্ষিত হয় না। আর তারই সূত্রে আখ্যানে কাহিনি, পাঠকৃতি এবং কথকের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনবাদ আবার ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই পরোক্ষে আখ্যানের আলোচনায় ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনা ও যুক্ত হয়ে পড়েছে। কথ্য ভাষা এবং উপন্যাসের ভাষার মধ্যে বিস্তর ফারাক। লেখক যখন বয়ান লিখছেন তার ভাব অনুযায়ী ভাষা নির্মাণ করে নিয়েছেন। সেই ভাষা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ব্যবহারিক ভাষা থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে থাকে।

আখ্যানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে আখ্যানতাত্ত্বিকরা একমত হতে পারেননি। আখ্যানের মূল বিষয় এবং আখ্যানের উপস্থাপন রীতির ভিন্নতার কারণে এই মতভেদ বলেই আমাদের

মনে হয়। আখ্যান উপস্থাপন রীতি ভিন্ন হলেও তিনটি মূল বিষয়কে সমস্ত আখ্যান তাত্ত্বিকই মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন তা হল—কথন বা Narration, পাঠকৃতি বা Text এবং কাহিনি বা Story। আখ্যানের প্রকাশ মাধ্যম ভিন্ন হতে পারে তবে সবের মধ্যেই আখ্যানের মূল বিষয় উপস্থিত থাকবেই। আমাদের আলোচনায় মূলত উপন্যাস নামক প্রকাশ মাধ্যমটিরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কাহিনি হল একটি বিমূর্ত বিষয়। তাকে মূর্তরূপ দানের জন্য একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে একটি মাধ্যম হল উপন্যাস। উপন্যাসে কাহিনির মূর্ত রূপ প্রকাশ পায়। আখ্যানের আলোচনায় যাকে পাঠকৃতি বা Text নামে অভিহিত করা হয়েছে। কাহিনির মূর্ত রূপ হল পাঠকৃতি। এই মূর্ত রূপই পাঠকের কাছে অর্থাৎ আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়।

আখ্যানের আলোচনায় আমরা মিখাইল বাখতিন-এর নাম বাদ দিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ করতে পারি না। তিনি আখ্যানের সময় ও পরিসর নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কার্যকারণ কার্যকারণ ব্যতীত কোনো কাহিনিই আখ্যান হয়ে উঠতে পারে না। আখ্যানের একটি উপাদান কাহিনি। তিনি আখ্যানে কাহিনির সময় কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ কাহিনি বা ঘটনার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। আবার তা পাঠকৃতিতে স্থান পায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে। এই দ্বিবিধ সময়ের মিলিত রূপই আখ্যানে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। আমরা এর সঙ্গে পাঠক সময়কেও যুক্ত করতে পারি। পাঠকৃতির সময়ের পরবর্তীতে আসে পাঠক সময়। অর্থাৎ কোন্ সময় পরিসরে পাঠকৃতিটি পাঠ করছে তাও আখ্যানের নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে মূলত আখ্যানতত্ত্ব ও আখ্যান সম্পর্কিত আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছি আজকের দিনে আখ্যানতত্ত্ব কতটা প্রাসঙ্গিক।

আমাদের আলোচনার বিষয় নির্দিষ্ট। মূলত উপন্যাস নিয়েই আমাদের আলোচনার বিস্তার। তাই বাংলা উপন্যাসের সূচনা থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, প্রথম যুগের উপন্যাসের ধরণ কেমন ছিল কতটা আখ্যান সমৃদ্ধ উপন্যাস সে সময় লেখা হয়েছে বা কতটা হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। তিনিও পাশ্চাত্য Novel কে সামনে রেখে বাংলা উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। কল্পনার আধিক্যে ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। তার আগেও কিছু প্রয়াস আমরা লক্ষ করি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্রের হাত ধরে। তবে তাঁরা মূলত সমসাময়িক সমাজকেই ভাষারূপ দিয়েছেন কল্পনার তুলনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে রাস্তায় না গিয়ে মূলত কল্পনার উপরই জোর দিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস গুলিও তারই পরিচয় বহন করে। পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুটি উপন্যাসে কল্পনারই আধিক্য। তবে বিশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাসে সেই রীতিকে ভেঙে আঁতের কথাকে বের করতে সচেষ্ট হয়েছে। লেখক প্রবেশ করেছেন মানুষের মনের অন্তঃপুরে। সাধুভাষা পরিত্যাগ করে চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। দেশের রাজনৈতিক বাস্তব পরিস্থিতিকে ভাষারূপ দিয়েছেন। আবার 'গোরা' উপন্যাসে বিশ্বভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে তিনি নিজেকে বারে বারে ভেঙে গড়েছেন। এইক্রমে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত উপন্যাসের রূপ বদলের আলোচনায় বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের একাধিক উপন্যাস আলোচনায় এসেছে এবং সেখান থেকে কিছু উদাহরণ দিয়ে সময়ের পরিবর্তনের বয়ানের পরিবর্তনের কালক্রম সূচিত করার প্রয়াস করা হয়েছে।

বিশ শতকের আশির দশকের কয়েকটি উপন্যাসকে নির্বাচিত করে আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে উপন্যাসগুলি কতটা আখ্যান সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে, আবার কোথায় কোথায় আখ্যান থেকে বিচ্যুত হয়ে অন-আখ্যানে পর্যবসিত হয়েছে। বিশ শতকের আশির দশকে নির্বাচিত উপন্যাসগুলি হল—প্রফুল্ল রায়-এর 'আকাশের নীচে মানুষ', (১৯৮১), গৌরকিশোর ঘোষ-এর 'প্রেম নেই' (১৯৮১), দেবেশ রায়-এর 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮)। এছাড়াও কিছু কিছু উদাহরণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ঠিক স্বাধীনতা পরবর্তী সময়, যখন সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়ে গণতন্ত্রের সূচনা হচ্ছে। বাহ্যিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু অন্তঃকাঠামোর

তেমন কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই না। আকাশের নীচে অবস্থানকারী মানুষগুলির অবস্থানই উপন্যাসে মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। শাসকের পদবির পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শোষণের কোনো পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি না। প্রান্তিকায়িত মানুষগুলি প্রান্তেই থেকে যায়, আর একটি বয়ান রচিত হয়, কিন্তু যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা জানতেও পারে না। সমাজ সভ্যতার কোনো আধুনিকতা তত্ত্বের কাছে পৌঁছায় না। লেখক উপন্যাসে এইসব নিম্নবর্গকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন কিন্তু তাদের মুখে কোনো প্রতিবাদ বসাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর 'প্রেম নেই' বয়ানে বাংলার মুসলমান সমাজের কথা বলেছেন। সেখানে নারী পুরুষ উভয়ের কথাই বলেছেন। 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন' ভূমি সমস্যা নিয়ে বয়ান গড়ে তুলেছেন। তবে আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে এই বয়ানের আলোচনায় সেভাবে কোনো আখ্যান প্রতিভাত হয়নি। মূলত কাহিনি প্রধান উপন্যাসই হয়ে উঠেছে। লেখক পরিণতির দিকে বড় বেশি নজর দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু মানুষের জীবন আখ্যান পরিণতির থেকে বেঁচে থাকার জীবনের কথাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লেখক সেদিক থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। 'প্রেম নেই' উপন্যাসে লেখক প্রমাণিত করে ছেড়েছে প্রেম আছে।

আশির দশকের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল দেবেশ রায়-এর 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। এখানে তিনি আধুনিক জীবন যাত্রা প্রান্তিকায়িত মানুষের জীবনে কীভাবে যন্ত্রণা বয়ে আনে তারই বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানেও একটা গল্প বা কাহিনি আছে, তার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে তিনি মানুষের কথাই বলেছেন। তবে যে মানুষের বয়ান মুখ্য হয়েছে সেই বাখারু আমাদের চেনা-জানার বাইরে। তার কোনো নাম-পদবি নেই, কোনো সমাজ নেই। পরিবার নেই। মালিকের পরিচয়েই তার পরিচয়। তার পরিচয় বারে বারে পরিবর্তন হয়েছে। তার কথা আমরা বিশেষ শুনতে পাই না, তবে তার কর্মের বিবরণ আমরা দেখতে পাই। তার নিঃশব্দ প্রতিবাদ আমাদের শিক্ষিত সমাজের মানুষের মনে দাগ কেটে যায়। কোনো পূর্বপরিচয় না দিয়েই উপন্যাসের সূচনা আবার যেন হঠাৎ করেই উপন্যাসের সমাপ্তি। মাঝখানে খানিকটা বাঁচার রসদ। তিস্তাপারের মানুষগুলির নিত্যদিনের বেঁচে থাকার আখ্যান হয়ে উঠেছে

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। চলাই যেন বাঘারুর জীবন। তিস্তাপার থেকে, আপলচাঁদ রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে উৎখাত হয়ে বাখারুরা নিঃশব্দে প্রতিবাদ জানিয়ে অন্য কোনোখানে যাবার জন্য হাঁটা লাগায়। পরের বৃত্তান্ত আর আমরা পাই না। অনেক সম্ভাবনা অনেক আশা অনেক আকাঙ্খা মনে রেখেই বয়ানের সমাপ্তি হয়েছে। যেখান থেকে অন্য বয়ানের সূচনা হতে পারে। আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে আলোচনায় এই বয়ানটি আখ্যান হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই আমাদের মত।

বিশ শতকের নব্বই-এর দশকের আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি উপন্যাসকে নির্বাচিত করে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নারী আখ্যানের আলোচনা করা হয়েছে। তার জন্য সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' ও অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাস এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক জীবন যাপন, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা। নারীশিক্ষা, এসব সত্ত্বেও আজও নারী ভোগ্য হয়েই রয়ে গেছে। নব্বই-এর দশকের নির্বাচিত নারী আখ্যানগুলিতে তারই ছবি আমরা লক্ষ করতে পারছি। নারীর বয়ানে নারীর অবস্থা আমাদের সামনে হাজির হয়েছে 'দহন' নামক Text এর মাধ্যমে। অন্যদিকে নিম্নবিত্ত নারীর আখ্যান হয়ে উছেঠে 'রাধিকাসুন্দরী'। সেখানে সমাজের খেটে খাওয়া নারীর জীবন যন্ত্রণার কথাই মুখ্য হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই নারী অবহেলিত, বঞ্চিত, ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছে। তবে রাধিকা সুন্দরীতে কিছুটা হলেও প্রতিবাদ আমরা দেখতে পাই তার তুলনায় দহনের প্রতিবাদ অনেক গৌন। শিক্ষিত মার্জিত সমাজে নারীর চেতনা যে আজও ছাই চাপা তা আমরা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে অনুভব করতে পারি। বিশ শতকের নব্বই-এর দশকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি বয়ান হল সমরেশ বসুর 'দেখি নাই ফিরে'। সেখানে একজন শিল্পীর আত্মকথা বর্ণিত হয়েছে। তথ্য সমৃদ্ধ বয়ান 'দেখি নাই ফিরে' জীবনীমূলক বয়ান ও বলতে পারি। সেখানে একজন শিল্পী তিনি ও একজন মানুষ, আত্মকথা লেখকের ভাষায় প্রকাশ পয়েছে। বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণ। তবে অভিজ্ঞতা সেখানে এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে যে উপন্যাস শিল্পের অন্য দিক গুলি চাপা পড়ে গেছে। জীবনী আখ্যান হয়েছে ঠিকই তবে আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে উপন্যাসের আলোচনায় তা যথার্থ আখ্যান

হয়ে উঠতে বাধা পেয়েছে। তবে সব বয়ানেই আখ্যান খোঁজা জটিলতার সৃষ্টি করা। তত্ত্ব জেনে যেহেতু শিল্পী বয়ান রচনা করেন না তাই একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বে সব শিল্প কর্মকে বাঁধা যাবে না।

সময়ের ছাপ সাহিত্য কর্মে খুবই প্রকট। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বদলায়, তার সঙ্গে বদলে যায় মানুষ তার বাঁচা, উপন্যাস যেহেতু সমাজেরই বিস্তৃত বিবরণ তাই সেখানে সময়ের ছাপ স্পষ্ট। সময়ের সাথে সাথে বয়ান পাল্টে যায়, বদলে যায় লেখকের মানসিকতা, তাঁর দর্শন, তার প্রভাব লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। আলোচনার শেষ অধ্যায়ে এই পরিবর্তনই দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। দুই দশকের বয়ানে বিষয়বস্তুটা বদলে গেছে, বদলে গেছে বয়ান বয়ানের ভাষা। আবার বিষয়ের সঙ্গে ভাষা সম্পর্কযুক্ত। তাই বিষয়ের সঙ্গে বয়ানের ভাষা কতটা বদলেছে বা আছেও বদলেছে কি না তারই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আশির দশকের চরিত্ররা যে ভাষায় কথা বলেছে নব্বই-এর বয়ানে তার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আবার একই দশকের বিভিন্ন বয়ানে চরিত্রের ভাষা ভিন্ন হয়ে গেছে।

উপন্যাস একটি মুক্ত শিল্প পরিসর। কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা উপন্যাসকে বাঁধা যায় না। গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে তার নতুন নতুন দিক আমাদের সামনে হাজির হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে আজও উপন্যাস শিল্প রূপটি ভাঙছে এবং গড়ছে। বিশ শতকের একটি সাহিত্যতত্ত্ব আখ্যানতত্ত্ব। আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বিশ শতকের শেষ দুই দশকের নির্বাচিত উপন্যাসের আলোচনায় আমরা মূলত দেখাতে চেয়েছি উপন্যাসগুলি কতটা আখ্যান সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, আর কোথায় কোথায় ত্রুটি থেকে গেছে।

'আখ্যানতত্ত্ব' একটি সাহিত্যতত্ত্ব। তার কাজ সাহিত্যের বিচার করা। তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি সাহিত্য প্রকরণে কতটা রক্ষিত হয়েছে তারই বিচার। কিন্তু কোনো একটি সাহিত্য প্রকরণ একটি তত্ত্বের আলোচনায় আবদ্ধ করা যায় না। একটি বয়ানে একাধিক তাত্ত্বিক প্রকাশ থাকতেই পারে। তাই একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের ক্রমে সব শিল্পকর্মকে বিচার করা মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। উপন্যাস যেহেতু একটি মুক্ত শিল্পরূপ তাই তাকে আখ্যানতত্ত্ব নামের একটি তত্ত্ব দিয়ে গণ্ডিবদ্ধ করা যাবে না। উপন্যাস শিল্পের একটা নান্দনিক দিক ও আছে তাকেও আমরা অস্বীকার করতে

পারি না। তাই আজকের দিনেও উপন্যাসের আনন্দদান ও বিচার বিশ্লেষণের কাজ একই সঙ্গে সমান্তরালে চলতেই পারে। উপন্যাস তার নিয়মে রচিত হতেই থাকবে এবং তাত্ত্বিকরাও তাদের বিচার বিশ্লেষণ চালিয়ে যাবে সমান্তরালভাবে।